প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ১২
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

দাম বারো আনা
প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৫৮

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

ভূমিকা

'নতুন পাঠশালা' প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজহিতৈষী বহু পাঠকের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, বইখানিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য। অনিবার্য কারণে এতদিন তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ইতিমধ্যে নতুন পাঠশালা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল। মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্যে প্রায় সাতখানি গান ও বহু দৃশ্য রয়েছে। মঞ্চের উপযোগী করে, চিত্রনাট্য থেকে নাটকখানি সঙ্কলিত করলাম। বলা বাহুল্য গোটা চিত্রনাট্য এতে নেই। আশা করি অনুরাগী বন্ধুদের চাহিদা মিটবে।

১৮এ বাদুর বাগান লেন
কলিকাতা ৯

বীরেন দাশ

আজাদ হিন্দ পিকচার্সের শ্রদ্ধার্ঘ্য বুনিয়াদী শিক্ষার পটভূমিকায় রচিত

বীরেন দাশের

নতুন পাঠশালা

আলোকচিত্র শিল্পী—	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী—	গৌরদাস
সুর—	বীরেন ভট্টাচার্য : অপরেশ লাহিড়ী
সঙ্গীত—	গোপাল ভৌমিক : সমীর ঘোষ : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নৃত্য—	প্রঃ ব্যাণ্ডো অতীনলাল
সম্পাদনা—	রবীন দাস
শিল্প-নির্দ্দেশ—	নরেশ ঘোষ
প্রযোজনা—	আজাদ হিন্দ পিকচার্স

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

চিত্রনাট্য : সংলাপ ও পরিচালনা—বীরেন দাশ

ভূমিকা-লিপি

বুবু—কনক
টুবু—হাসি
বাবলু—সূর্য
ভোলা—নেতো
গোপাল—লক্ষ্মী
গোপা—রেণু
রবি—রবিপ্রকাশ
রূপ—রূপকুমার

মঞ্জু, গৌরী প্রভৃতি

পার্শ্ব চরিত্র

মহাজন—নরেশ মিত্র

পরেশ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

কবিরাজ—জহর রায়
সুরথ—অভী ভট্টাচার্য
পণ্ডিত—পরেশ ঘোষ
সুরুচি—শোভা সেন
সাবডিপুটী—অরুণ রায়
রাখাল—ধীরেন সরকার
মা—শেফালিকা (পুতুল)
সুব্রত—রবীন রায়
শরাফত—দুর্গাদাস
ভরত—রবীন দত্ত

অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে

বীরেন দাশের লেখা

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি

আকাশ জয়ের গল্প

রূপকথায় লেনিন

সোনালি সকাল

স বু জ দি ন

খে লা ঘ র

পড়াশুনা

ইন্দ্রজাল

রুমমেট

সন্ধান

ইত্যাদি

(বড়দের)

মেট্রোপলিস্

চাঁদ ও রাহু

আরো দূর পথ

হে সৈনিক তোল নিশান

ইত্যাদি

শ্রীমান্ বিবেকানন্দকে (বিলি) দিলাম

বীরেন দাশ প্রণীত

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি

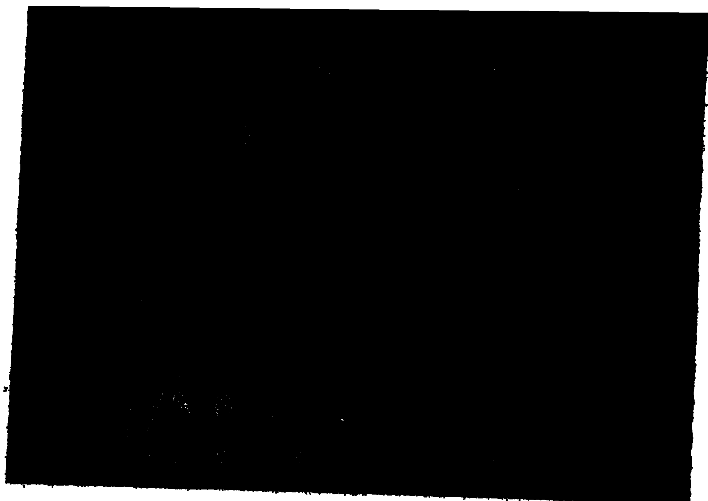
(ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৭৫৭ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)

উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ঘটনাবহুল ইতিহাসের একপৃষ্ঠা। পলাশীর যুদ্ধ থেকে সুরু করে ভারতের প্রথম বিপ্লবী সহিদ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলার সব চাইতে দুর্য্যোগময় রাত্রির বিস্মৃত প্রায় কাহিনী বীরেন বাবুর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেড

কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

নতুন পাঠশালা



শ্রীমতি শেফালিকা (পুতুল), কমলা রায় ও হাসি



[illegible]

নতুন পাঠশালা

১

(ধারিক মহাজনের বাগান ফুলবিহার। সেখানে অজস্র ফুল ও ফলের ছড়াছড়ি। আমবাগান, পেয়ারাবাগান, লিচুবাগান প্রভৃতি ছাড়াও ওখানে রয়েছে বিরাট এক দীঘি, আর দীঘির সামনে অনেকখানি উঁচু ফাঁকা যায়গা। খেলাধূলো করবার মত এমন যায়গা রাঙামাটি গ্রামে আর কোথাও পাবে না তুমি। মোটকথা ছেলেরা যা চায়, সবই রয়েছে ফুলবিহারে। কিন্তু ধারিক মহাজন ওদের কিছুতেই বাগানে ঢুকতে দেবে না। ছেলেরাও নাছোড়বান্দা। ফাঁক পেলেই অমনি ঐ ফুলবিহারে ওদের যাওয়া চাই। এমনি এক বিকালবেলা, ধারিক মহাজন বাড়ী নেই,—দরজায় তালা ঝুলছে দেখতে পেয়ে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা হুড়মুড় করে এসে বাগানে ঢুকে খুব হল্লা করতে সুরু করেছে। ধারিক মহাজন আড়ি পেতে ছিল। ছেলেমেয়েরা ভেতরে ঢুকতেই, মস্ত বড় এক পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করে দরজা আগলে দাঁড়াল সে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ)

মহাজন—পাজি ছুঁচোর দল। রোজ রোজ আমার বাগানে ঢুকে রাহাজানি করিস। মনটা আমার নরম, তাই এতকাল কিছু বলিনি।

আজ কড়ায়-গণ্ডায় তার শোধ তোলব। হ্যাঁ, এই লাঠি দিয়ে সব কটার পা ভাঙব। খোঁড়া হয়ে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়াবি। জীবনে আর কোনদিন ফুলবিহারে ঢুকতে পারবিনি!

(ততক্ষণে দরজার ভেতরে খানিকটা তফাতে ছেলেমেয়েরা এসে জড় হয়েছে। তাদের চোখেমুখে ভয়। সত্যিই ত। কি বিপদ! শুধু তাদের সর্দার বাবলু ঠোঁট কামড়ে কি মতলব আঁটছে।)

মহাজন—এই আমি লাঠি নিয়ে বসলাম। দেখি কেমন করে বাগান থেকে তোরা আজ বেরোস। হ্যাঁ!

(সত্যিসত্যিই বসে পড়ল মাটীতে। ওদিকে বাবলু ছেলেদের কাণে কাণে কি বলতে লাগল। মহাজন রেগে, উঠে দাঁড়াল।)

মহাজন—ভেবেছিস মহাজনের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবি? পাঁজি-ছুঁচোর দল! মনটা আমার নরম, তাই এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। কিন্তু আর না।

(লাঠি হাতে মহাজন এগোতে লাগল। ছেলেমেয়েরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু তাদের নেতা বাবলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল।)

বাবলু—(সুর করে) দ্বারিক মহাজন! মনটা আমার নরম।

(আর যায় কোথায়! মহাজন লাঠি নিয়ে বাবলুকে তাড়া করলে। তাড়া করে মহাজন বাগানের ভেতর বেশ খানিকটা দূর চলে গেছে।)

মহাজন—(ছুটতে ছুটতে) তবে রে পাজিছেলে—

(এদিকে ফাঁক পেয়ে ছেলেমেয়েরা দলে দলে হুড়মুড় করে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। মহাজন না পারলে বাবলুকে ধরতে, না পারলে আর কাউকে! ছেলেরা চলে যাচ্ছে, দেখতে পেয়ে সে দরজার সামনে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।)

মহাজন—তাইত! সবাই যে চলে গেল!

২

(বাগানের সামনে খোলা রাস্তার ধারে উঁচু টিবিতে ছেলেমেয়েরা দ্বারিকের মুখোমুখি দাড়িয়ে টিটকারী দিয়ে ছড়া কাটতে লাগল।)

ছেলেমেয়েরা সবাই—(সুর করে)

ফো ফো ফো
ধরতে পারলে না!
ধরতে পারলে না!

১ম দল— দ্বারিক মহাজন!
দ্বারিক মহাজন।
দম্ দমাদম্ দম্
দম্ দমাদম্ দম্
ও দ্বারিক মহাজন!

(গ্রামের রাস্তা তো আর মহাজনের সম্পত্তি নয়! ছেলেরা দ্বারিক মহাজনের সামনে খুব হুল্লোড় করছে। ভেংচি কাটছে, জিভ দেখাচ্ছে। মহাজন লাঠি হাতে রাগে ফুলছে।)

২য় দল— ঘারিক মহাজন !
মারবে লাঠি, ভাঙবে পা-টা
দম্ দমাদম্ দম্
দম্ দমাদম্ দম্ ।
ও ঘারিক মহাজন !

(বেচারা ঘারিক মহাজন। রাগের চোটে লাঠি হাতে ছেলেমেয়েদের ছড়ার তালে তালে নাচতে সুরু করেছে সে তখন।)

৩য় দল— ফুলবিহারে এসো না,
ঘারিকের কাছে ঘেঁষো না,
দম দমাদম্ দম্
দম দমাদম্ দম্
ও ঘারিক মহাজন।

৪র্থ দল— ছোটরা সব পালাল
নটেগাছটা মুড়োল।
ঘারিকের আশা ফুরুলো।
হায়রে কপাল !
হায়রে কপাল !!

সবাই (এক সঙ্গে)—এবার নিজের পিঠে ভাঙো লাঠি,
দম দমাদম্ দম্
দম দমাদম্ দম্।
ঘারিক মহাজন !

(ছেলেমেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। মহাজন আর সহ্য করতে পারলে না। মারলে ছুঁড়ে হাতের লাঠি। ছেলেমেয়েরা সবাই পালিয়ে গেল। ভাগ্যিস লাঠি কারো গায়ে লাগেনি! বাবলুও এই সুযোগে পালাল। মহাজন তখন আর কি করে—দাঁত কড়মড় করে ফুলবিহারের দরজা বন্ধ করতে লাগল।)



(গ্রামের রাস্তা। রাস্তার ধারে পোড়োবাড়ীর সামনে একদল ছোট্ট ছেলেমেয়ে, খোঁড়া ভিখারী হবুকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। বেচারা খোঁড়া! মনে মনে ভীষণ রেগে গেছে সে। কিন্তু তা বলে ত আর এসব বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মারধর করা যায় না! পা দেখিয়ে ছোটরা সুর করে বলছে—)

ছোটরা—খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
কার বাড়ীতে গিয়েছিলি
কে ভেঙেছে ঠ্যাং।
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং।

(সুরুচি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কাণ্ডকারখানা দেখে নেমে এল এদের পাশে। সুরুচিকে দেখে সবাই ভয়ে চুপ করে গেল। সুরুচি নতুন এসেছে গ্রামে। পরিচয় নেই।)

সুরুচি—ও কি হচ্ছে, ছিঃ। অমন বলতে নেই। বেচারার এমনিতেই মনে কত কষ্ট। তার উপর তোমরা ক্ষ্যাপাচ্ছ!

টবু—আমরা ত ছড়া কাটছিলাম।

বুবু—ক্ষ্যাপাইনি ত।

সুরুচি—এমন কিছু বলতে নেই, যাতে কারো মনে আঘাত লাগে। ছড়া কাটবে? আচ্ছা একটা মজার ছড়া তোমাদের শেখাচ্ছি।

(একঝাঁক বক্ আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সুরুচি দেখে নিল।)

সুরুচি—এস আমরা বক্ মামাকে ডাকি।

(সুর করে) বগা মামা বগা মামা
উড়ে যাবার দাম দে।
বেশী কিছু চাইনে মামা
চিনিয়া বাদাম দে!

(সুরুচির মুখে ছড়া শোনে ত সবাই বেজায় খুসী।)

সুরুচি—এস আমরা সবাই এক সঙ্গে বলি।

সুরুচি ও ছোটরা সবাই (সুর করে)—বগা মামা বগা মামা
উড়ে যাবার দাম দে।
বেশী কিছু চাইনে মামা
চিনিয়া বাদাম দে।

সুরুচি—চমৎকার! তোমরা রোজ বিকালবেলা আমাদের বাড়ীতে এসো। কত মজার মজার ছড়া শেখাব। আসবে ত? আমাদের কোন্ বাড়ী বল ত? মহাজনের বাড়ীর ঠিক পাশেই—পরেশবাবুর বাড়ী।

টবু—পরেশবাবু আপনার কে হন?

সুরুচি—পরেশবাবু আমার বাবা! তোমরা আসবে ত?

বুবু—না।

(সহসা ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল। গাঁয়ের ছোটরা বড্ড লাজুক। সুরুচি ফিরে তাকাল। সুরথ আসছে।)

সুরুচি—সুরথদা!

সুরথ—রুচি!

সুরুচি—তুমি গাঁয়ে এসেছ, কেউ বলেনি ত!

সুরথ—কেমন করে বলবে, আমি যে আজই এলাম।

সুরুচি—থাকবে ত কিছুদিন গাঁয়ে?

সুরথ—থাকব বই কি। আমি এখানে এসেছি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিয়ে।

সুরুচি—সত্যি বলছ সুরথদা! আমিও যে বুনিয়াদী শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে ট্রেণিং নিয়ে এসেছি!

(পরেশবাবুর গলার স্বর শোনা গেল। তারা ফিরে তাকাল।)

পরেশ—তা'লে ত ভালই হল। দুজনে মিলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাস্তব করে তোল এবার!

সুরথ—পরেশ কাকা!

(পায়ের ধূলো নিলে। এঁদের সঙ্গে সুরথের ছেলেবেলার আলাপ। আজকাল তারা বিদেশে বিভিন্ন যায়গায় থাকেন। তাই অনেক কাল দেখা হয়নি।)

পরেশ—কেমন আছ সুরথ! তুমি এসেছ, খবরটা পেয়েই বেরিয়েছিলাম পথে।

সুরথ—আপনাদের পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার!

সুরুচি—জান সুরথদা, গাঁয়ে এসে অবধি শুনছি, এখানকার ছেলেমেয়েরা ভারী দুর্দ্দান্ত। ইস্কুল-টিস্কুল করে এখানে সুবিধে হবে না। পণ্ডিতের পাঠশালাই অচল! কিন্তু আমার কি মনে হয় জান সুরথদা! প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেলে, দুর্দ্দান্ত ডানপিটে ছেলেরাই হয় আদর্শ নাগরিক।

সুরথ—ঠিক বলেছ। বুনিয়াদী শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পক্ষে।

পরেশ—আমি নিজে ঘরে ঘরে যেয়ে চাষীদের ঐকথাই বুঝিয়ে বলব! বাড়ী চল। ওখানে সব কথা হবে, হ্যাঁ।

(তারা চলতে সুরু করেছেন।)

৪

(সাবডিপুটীর বাংলো। সাবডিপুটী ও সুরথ।)

সাবডিপুটী—আপনি ঠিকই বলেছেন সুরথবাবু। গ্রামের শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভবিষ্যৎ আত্মনির্ভরশীলতার উপরই, ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম—তথা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সুরথ—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ গান্ধীজি পরিকল্পিত এই নতুন পাঠশালার শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা। কারণ এই শিক্ষা দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশ হয়। আর শিশুকে তার জন্মস্থানের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত করে।

সাবডিপুটী—সত্যিকথা। নতুন পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য পাবেন আপনি।

(চৌকিদার প্রবেশ করে সালাম করে।)

চৌকিদার—ঘোড়া পাওয়া গেছে হুজুর। কারা বটগাছে বেঁধে রেখেছিল।

সাবডিপুটী—আমি বুঝতে পাচ্ছি নে, আমার ঘোড়া বটগাছের সঙ্গে কারা বেঁধে রাখলে!

সুরথ—আপনি কি রোজ রাত্তিরে ধানক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দেন?

সাবডিপুটী—না না, তা কেন, তা কেন। আর, ঘোড়া ধানক্ষেতে গিয়ে কারো ক্ষতি করেছে এ নালিশ ত কেউ আজো করেনি।

সুরথ—সাহস পায়নি হয়ত নালিশ জানাতে। রাত্তিরবেলা ঘোড়া আটকে না রাখলেই ধানক্ষেতে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সাবডিপুটী—হুঁ। এবার থেকে ঘোড়া আটকে রাখতে হবে। কিন্তু কাল রাতে ঘোড়া আটকালে কে বলুন ত!

সুরথ—আপনি কি তাকে শাস্তি দিতে চান?

সাবডিপুটী—না, বরং আমি তাকে পুরস্কৃত করতাম, তার সৎসাহসের জন্য!

সুরথ—(হেসে) আমার ধারণা, গাঁয়ের কোন ছেলে-ছোকরা এ-কাজ করেছে!

(সাবডিপুটী উত্তরে কিছুই বললে না।)

সুরথ—আমি তা'লে উঠি এখন।

সাবডিপুটী—একটু বসুন, দুজনে একসঙ্গে গাঁয়ে বেরোব।

৫

(রাঙামাটী পাঠশালা। দুপুর গড়িয়ে পড়ছে। পণ্ডিত টেবিলে পা তুলে, চেয়ারে মাথা এলিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা

হৈ চৈ হুল্লোড় করছে। সাধারণত হুল্লোড়ের মাত্রা বেশী না হলে পণ্ডিতের ঘুম ভাঙ্গে না। কিন্তু ছেলেদের বরাত মন্দ সেদিন। বাবুল হঠাৎ সিটি দিলে, অমনি পণ্ডিতেরও ঘুম গেল টুটে।)

পণ্ডিত—(রক্তচক্ষু) মূর্খের দল! দুপুরবেলা যে একটু বিশ্রাম করব, তোদের জ্বালায় তারও কি জো আছে! কে সিটি দিয়েছে? (টেবিল চাপড়ে) কে সিটি দিয়েছে? (সবাই নীরব) গোপাল?

গোপাল—(কাঁদো কাঁদো গলায়) আমি শুনতে পাইনি পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত—সাবাস্ ছেলে সাবাস্! একেই বলে তোমার গিয়ে সত্যবাদী বালক। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিটি শুনতে পেলাম, আর তুই কিনা জেগে জেগেও শুনতে পাস্‌নি! হুঁ, বুঝেছি। সাহিত্য বই খোল দিকি তোমরা। (ছেলেরা সাহিত্যপাঠ নিলে) আজকের পড়া বার কর।

পণ্ডিত (সুর করে)—"যখন মানবকুল ধনবান হয়।
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে ঐ তরুগণ।
অহংকারে উচ্চশির করে না কখন।"

পণ্ডিত—(ব্যাখ্যা করতে লাগল) যখন মানবকুল অর্থাৎ কিনা মনুষ্য-সমাজ বিত্তশালী হয়, তোমার গিয়ে তখন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু ফলফুলে যখন ঐ বৃক্ষগুলো সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, কই, তারা ত তোমার গিয়ে, গর্ব্বে মাথা উঁচু করে না? কেন করে না বাবলু?

বাবলু—কারণ, গাছ ত আর মানুষের মত নড়াচড়া করতে পারে না।

পণ্ডিত—তোমার সোনার মাথায় গোবর ভর্ত্তি। কান ধরে বেঞ্চে উঠে দাঁড়া!

(বাবলু শাস্তিগ্রহণ করে)

পণ্ডিত—ভোলা? রবি? যদু? হাঁদু?

(এক এক করে সবাই কান ধরে বেঞ্চে উঠে দাঁড়াল।)

পণ্ডিত—গর্দ্দভের দল! কে বাকী রইল—নেপা?

নেপা—কারণ, কারণ পণ্ডিত মশাই, ধনীরা গাছগুলোর মত বিনয়ী নয়!

পণ্ডিত—(খুসী) ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস। মানুষের ট্যাঁকে দু'পয়সা জমলেই, তোমার গিয়ে তারা শিষ্টাচার ভুলে যায়। হয়ে ওঠে উদ্ধত, দুর্বিনীত। কিন্তু গাছ-পালা ফলফুলে যত সমৃদ্ধ হবে, ততই তারা নুয়ে পড়বে বিনয়ে।

গোপাল—মানুষ যদি গাছপালার মত অচল হত, তারাও খুব বিনয়ী হত, না পণ্ডিতমশাই?

(পণ্ডিত রেগে যায়)

পণ্ডিত—কি, কি বললি। হতভাগা ছেলে ডেপোঁমো করবার যায়গা পাসনি?

গোপাল—বারে, ডেপোঁমো করলাম কখন।

(চোখে হাত দিল)

পণ্ডিত—আবার চোখে হাত দিয়েছিস? হাত নামা, হাত নামিয়ে রাখ বলছি। হ্যাঁ, আজকের পড়া মুখস্থ বল্।

গোপাল—(ঢোঁক গিলে) পড়া ..পড়া ত হয়নি পণ্ডিতমশাই! মঙ্গলবার রাত্তিরে আমার জ্বর হয়েছিল কিনা, তাই মা বললে, গোপাল, আজ আর পড়ে কাজ নেই।

পণ্ডিত—আবার মিছে কথা বলছিস, এ্যাঁ? (বেত তুললে।)

গোপাল—মারবেন না, মারবেন না পণ্ডিতমশাই! আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আর কোনদিন আপনার পাঠশালায় আসব না।

পণ্ডিত—আর কোনদিন আসবিনি। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তবে রে ছোঁড়া!

(উঠে এসে পণ্ডিত নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করতে লাগল গোপালকে। গোপাল চেঁচাচ্ছে।)

গোপাল }— মা গো! মেরে ফেললে গো!
পণ্ডিত }— বল্‌বি? ও কথা বল্‌বি আর। বল্‌বি!

(দরজায় সুরথ ও সাবডিপুটীকে দেখে পণ্ডিতের হাত স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা ঘরে ঢুকল।)

সাবডিপুটি—গোলমাল শুনে ঘরে না ঢুকে পারলাম না।

পণ্ডিত—আর বলেন কেন স্যার! এই যে এদের দেখছেন, এরা স্যার, এক একটি ক্ষুদে শয়তান।

সুরথ—তা বলে এমনিধারা মার!

(সুরথের কথায় পণ্ডিত অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু কিছুই বললে না। সাবডিপুটীর দৃষ্টি পড়ল বাবলু, ভোলা, ও অন্যান্য—যারা বেঞ্চে দাঁড়িয়ে, তাদের উপর।)

সাবডিপুটী—এরা সব উঁচুতে দাঁড়িয়ে কেন?

পণ্ডিত—এই, নীচে নেমে নিজেদের যায়গায় বসো।

(তারা আদেশ পালন করে।)

সাবডিপুটী—আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, আপনার ছাত্রদের ভেতর কারা ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ?

(বাবলু ও ভোলা পরস্পরের দিকে তাকাল। সাবডিপুটী দেখতে পায়।)

পণ্ডিত—ঘোড়া! তা ত জানি নে!

(সাবডিপুটী ভোলার সামনে এগিয়ে এল।)

সাবডিপুটী—তোমার নাম কি খোকা?

ভোলা—ভো—ভোলানাথ।

সাবডিপুটী—ভোলানাথ। বাঃ! নামটা ত চমৎকার! কে যেন বলছিল, তুমি একজন ঘোড়-সোওয়ার।

(ভোলা ঘাবড়ে গেল)

ভোলা—না না, আমি না, আমি না—বাবলু, বাবলু আপনার ঘোড়া আটকেছে।

পণ্ডিত—(বিস্মিত) বাবলু! তাহলে তোমার এই কাজ। তুমিই ঘোড়া আটকেছিলে! কেন?

বাবলু—রাত্তিরে মাঠে এসে ঘোড়া ধান খেয়ে যায়, তাই।

পণ্ডিত—ধান খেয়ে যায়। তা বলে ডিপুটীসায়েবের ঘোড়া আটকাবি? মাঠের ধান তোর বাপের? তবে রে ডেঁপো ছোকরা।

(বেত তুললে, মারবে।)

সাবডিপুটী—থামুন! সত্যিকথা বলে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে, তাই ছেলেটাকে আপনি শাস্তি দিতে চান? এই কি আপনার পাঠশালার শিক্ষা?

(পণ্ডিতের হাত থেকে বেত পড়ে গেল। সাবডিপুটী বাবলুর কাঁধে হাত রাখলে।)

সাবডিপুটী—বাবলু, আমার ঘোড়া আটকে তুমি যে সৎ-সাহসের

পরিচয় দিয়েছ শুধু ছোটরা নয়, গাঁয়ের বয়স্কদের ভেতরও তার একান্ত অভাব।

(পকেট থেকে একটা টাকা বার করে)

এই নাও, মিষ্টি কিনে খেয়ো।

(বাবলুর হাতে টাকা গুজে দিল।)

সুরথ—পণ্ডিতমশাই। ছোটদের হাতের কাজ শেখাবার জন্যে গাঁয়ে একটা বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলতে চাই আমরা।

পণ্ডিত—হাতের কাজ?

সুরথ—এই যেমন চাষবাস, সুতোকাটা, কাপড়বোনা, এসব আর কি। পড়ালেখাও শিখবে তারা, তবে বই মুখস্থ করে নয়, হাতের কাজের ভেতর দিয়ে।

পণ্ডিত—ও। তা আমি কি করব?

সুরথ—আপনি আমাদের দলে আসুন।

পণ্ডিত—কথাটা ভেবে দেখব।

সাবিত্রীপুটি ও সুরথ —আজ আসি তাহলে।

(নমস্কার করে বেরিয়ে গেল)

(ছেলেমেয়েরা সব আবার হল্লা সুরু করেছে। পণ্ডিত চেয়ারে বসল।)

পণ্ডিত—চুপ চুপ। চুপ কর সব। পাঠশালা নয় যেন মাছের বাজার। বলে কিনা, বেত মারবেন না।

(বেত খুঁজতে লাগল)

বেত? আমার বেত। কে নিলে আমার বেত?

৬

(মহাজনের বাড়ীর দাওয়া ও উঠান। মহাজন ভরতকে খাতা দেখাচ্ছে।)

মহাজন—এই ছাখো, খাতায় লেখা নেই। সুদের টাকা তুমি দাওনি। দিলে কি আর খাতায় লেখা থাকত না।

ভরত—বল কি মহাজন! আমি সেদিন চারটাকা সোওয়া চার-আনা দিয়ে গেছি তোমাকে। আর এখন তুমি আমাকে খাতা দেখাচ্ছ? বলি, আমি যদি লেখাপড়া জানতাম, তুমি কি আব এমন করে আমার সামনে খাতা মেলে ধরতে।

মহাজন—কি, আমাকে মিথ্যাবাদী জোচ্চোর বলছিস! অস্পর্দ্ধা ত তোর কম নয়!

ভরত—না না, তুমি মিথ্যেবাদী হবে কেন, মিথ্যেবাদী আমি।

মহাজন—(করুণ স্বরে) মনটা আমার নরম। কারো অভাব অনটন দুঃখকষ্ট দেখে চুপ করে থাকতে পারি না। নিজে না খেয়ে টাকা ধার দিই। এই তার ফল!

ভরত—(বিব্রত) আমায় ক্ষমা কর মহাজন! অভাবী মানুষ। মাথার ঠিক নেই। আমারই ভুল হয়েছে। সুদের টাকা আমি দু'একদিনের ভেতর দিয়ে যাব।

(চলে গেল)

(মহাজন মনে মনে খানিকটা হেসে নিলে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল কবিরাজ।)

কবিরাজ—শুনেছ মহাজন! ডিপুটী সাহেব পাঠশালায় ঢুকে নাকি রীতিমত অপমান করেছে আমাদের পণ্ডিতকে। বাবলুকে বেত মারতে গেছল—এই তার অপরাধ।

মহাজন—বল কি হে!

(অন্যদিক দিয়ে পণ্ডিত প্রবেশ করল।)

মহাজন—এই যে পণ্ডিত, এসব কি শুনছি!

পণ্ডিত—শুনেছ ঠিকই। সুরথ—চৌধুরীদের সুরথ গাঁয়ে এসেছে পাঠশালা করতে। ছেলেদের হাতের কাজ শেখাবে।

মহাজন—তোমাকেও ওসব কথা বলেছে নাকি?

পণ্ডিত—বলে কিনা, 'পণ্ডিত মশাই, আপনিও আসুন আমাদের দলে।'

মহাজন—খবর্দ্দার। ওর দলে যাবে না। গিয়েছ কি একদম সর্ব্বনাশ!

পণ্ডিত—তা কি আর আমি বুঝিনে। কিন্তু চাষীরা যদি আমার পাঠশালায় ছেলেমেয়ে না পাঠিয়ে ওর পাঠশালায় পাঠাতে সুরু করে?

মহাজন—কেন ভাবছ! চাষীরা যাতে নতুন পাঠশালায় ছেলে-মেয়ে না পাঠায় সব ব্যবস্থা আমি করছি।

কবিরাজ—হুঁ! (হুঁকো টানতে টানতে) সাধ্য কি চাষীরা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে।

মহাজন—বুঝলে পণ্ডিত, সুরথকে এ-গ্রাম থেকে তাড়াতেই হবে।

পণ্ডিত—তা কি আর আমি বুঝিনে। সুরথ এখানে থাকলে একদিন-না-একদিন—

(জিভে কামড় দিয়ে থেমে গেল।)

মহাজন—কবিরাজ বুঝলে অর্থাৎ কি না একদিন-না-একদিন দাঙ্গা-হাঙ্গামা…অর্থাৎ কি না…আমি এক্ষুনি আসছি।

(ঘরের ভেতর গেল।)

কবিরাজ—(জনান্তিকে) একদিন-না-একদিন?…কোন গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে না ত হে!

পণ্ডিত—সে খবরে তোমার কাজ কি হে! পরচর্চ্চা ছেড়ে বড়ি পাকাও গে' কবিরাজ মশাই। ঘরে দুটো পয়সা আসবে।

কবিরাজ—হুঁ।

(ইতিমধ্যে চাষীরা আসতে সুরু করেছে। শরাফত, মুরত, রহিম, আরো অনেকে। নমস্কার, সালাম প্রভৃতি করে তারা উঠানে নিজেদের যায়গায় বসল। মহাজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারা সবাই আর একবার 'সালাম' 'নমস্কার' ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলল মহাজনের প্রাঙ্গণ।)

মহাজন—এই যে তোমরা এসেছ। আজ একটা বিশেষ কারণে তোমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছি। নতুন পাঠশালায় তোমরা কেউ ছেলেমেয়ে পাঠাতে পারবে না।

শরাফত—আজ্ঞে হুজুর, সুরথবাবু বলেন, নতুন পাঠশালার উদ্দেশ্য গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ শেখানো।

রহিম—সুতো কাটা, কাপড় বোনা।

মুরত—মিস্ত্রীর কাজ।

শরাফত—চাষবাস।

মহাজন—বিশ্বাস করো না ওসব কথা মোটে।…হাসিও পায়, দুঃখও হয়। শেষকালে পাঠশালায় যেয়ে চাষীর ছেলেকে চাষবাস শিখতে হবে নাকি? রাখাল তাঁতির ছেলে বাবলু তাঁত চালানো শিখবে?

কবিরাজ—আমরা পাঠশালায় ছেলেপিলে পাঠাই দু'আখর পড়ালেখা শিখে ভদ্র হতে। মিস্ত্রীর কাজ শিখতে নয়। কি বল হে শরাফত মিঞা?

শরাফত—আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক কথা।

পণ্ডিত—তা'হলে বলো নতুন পাঠশালায় তোমরা কেউ ছেলে পাঠাবে না ?

শরাফত—আজ্ঞে না। (অন্যান্য চাষীদের) কি বল হে তোমরা ?

চাষীরা সবাই—আজ্ঞে না, ছেলেমেয়ে আমরা পাঠাব না।

৭

(পাঠশালা। পণ্ডিত তন্দ্রামগ্ন। ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছে—মানে হুল্লোড় করছে। সবার কণ্ঠের উপর দিয়ে ভোলার কণ্ঠ শোনা যায়। ভোলা পণ্ডিতের ভাগ্নে।)

ভোলা—(সুর করে পড়ছে)

রাম—বড় রাণী কৌশল্যা পুত্র।
রাম—বড় রাণী কৌশল্যা পুত্র।
রাম—বড় রাণী কৌশল্যা পুত্র।
রাম—বড় রাণী কৌশল্যা পুত্র।

পণ্ডিত—(চোখ মেলে) এ্যাঁ! রাম বড় রাণী! বলিস কিরে! দেখি কোথায় লেখা আছে। (সাহিত্য বই দেখলে) ওঃ! আমিও ত বলি। ভাল করে চোখ চেয়ে পড় হতভাগা। "রাম বড়রাণী কৌশল্যার পুত্র।" যত সব গাধার দল! বাবলু ?

বাবলু—পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত মশাই—শুনলুম নাকি কাল নতুন পাঠশালার উদ্বোধন উৎসব।

বাবলু—হ্যাঁ, পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত মশাই—তোমরা কেউ ও বাড়ীতে যেতে পাবে না।

গোপাল—কাল যে রবিবার স্যার!

পণ্ডিত—রবিবার—রবিবার ত কি হয়েছে? হুঁ! কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই বটগাছের নীচে এসে জড় হবে। ছোট ভাইবোনদেরও সঙ্গে নিয়ে আসবে। কথাটা মনে থাকবে ত?

বাবলু—থাকবে পণ্ডিত মশাই!

৮

(পরেশবাবুর বাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপের দরজায় ঝুলছে লাল কাপড়ের উপর সাদা তুলো দিয়ে লেখা সাইনবোর্ড। "নতুন পাঠশালা। আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।" মণ্ডপে গোটাকতক চরকা, তকলি, তুলো প্রভৃতি রয়েছে। পরেশবাবু অধীরভাবে পায়চারি করছেন। সুরথ গম্ভীর মুখে বসে তকলি কাটছে। সুরুচি উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। কিন্তু পথ শূন্য। ছেলেমেয়েদের টিকিও দেখা যায় না।)

পরেশ—কেউ আসবে না। পণ্ডিত সবাইকে ডেকে নিয়ে বটগাছ তলায় আটকে রেখেছে।

সুরথ—আশ্চর্য! একজনও যদি আসত!

সুরুচি—আসবে যখন, সবাই আসবে। গ্রামের কোন ছেলেমেয়েই বাদ পড়বে না।

পরেশ—অতখানি ভরসা করতে পারছি নে রুচি!

সুরথ—কিন্তু কবে, কখন আসবে তারা?

(সুরুচি উত্তর দিল না। চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটিতে হেলান দিয়ে গান ধরল। চমৎকার মিষ্টিগলা সুরুচির।)

সুরুচি—(গান) ফুলে ফুলে মৌমাছিদের ঐ যে কানাকানি,
ঐ ত তোদের মাটির মায়ের নিমন্ত্রণের বাণী।
আয় আয আয়।
ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে আয়
বাঁকা নদীর পাড় দিয়ে আয়
সবুজ সোহাগ ছড়িয়ে হোথায়
হাসে যে গ্রামখানি।
ঐ ত তোদের মাটির মায়ের নিমন্ত্রণের বাণী।
আয় আয় আয়।

(সুরুচি গাইছে)
পাখীর পাখা আবীর মাখা প্রথমদিনের বীর।
আর মিঠে সুরে বাজায় বাঁশী কিশোর রাখাল কবি।
এত যে রূপ ঐ ত তোদের আসল মায়ের ছবি
আয় আয় আয়।

শাপলা-শালুক পদ্মভরা ছায়ায় কালো বিল
তারি মাঝে মুখ দেখে ঐ আকাশ ঘন নীল।
কুঁড়িয়ে যত ছোট্ট শিশু মায়েরই কোল খোঁজে।
মা ছাড়া তার অবোঝ হৃদয় কিছুই নাহি বোঝে।
ঝাঁপি খোলে লক্ষ্মী মা যে দেবেন আশীষ আনি।
আয় আয় আয়। *

(কি আশ্চর্য! গান শেষ হবার আগেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা

---

* এই গানটী রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সবাই পরেশবাবুর বাড়ীতে ছুটে এসেছে। সুরথ ও সুরুচি তাদের আদর করে চণ্ডীমণ্ডপে বসায়।)

পরেশবাবু—কেমন করে তোমরা এলে পণ্ডিতমশাইর চোখে ফাঁকি দিয়ে?

বাবলু—পণ্ডিতমশাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন ত!

সুরথ—তাই বল। হ্যাঁ, তোমরা গান শুনতে খুব ভালবাস, না? (সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়) এখানে পড়া-শুনা, খেলাধূলোর মত তোমরা নিয়মিত গান-বাজনাও করবে।

বাবলু—গান-বাজনা করব! কি মজা!

সুরথ—নতুন পাঠশালার শিক্ষার প্রথম কথা হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যাদের কাপড়জামা নোংরা, যারা নিয়মিত গাত্রমার্জ্জনা ও স্নানাদি করে না, তাদের যে শুধু রোগই হতে পারে, তা নয়, তারা উচ্চ চিন্তার অধিকারী হতে পারে না।

(ছেলেদের গায়ের জামা-কাপড় নোংরা। চুল অবিন্যস্ত। হাতে মুখে কালি-ঝুলি, মাটি। তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।)

সুরথ—তাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

(চিরদিনের অভ্যাস মত গোপাল সিটি দিল। সুরথ তাকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু পণ্ডিত মশাইর মত মারপিট করলে না সুরথ।)

সুরথ—(হাসি মুখে) বাঃ! তুমি ত বেশ সিটি দিতে পার! তোমার নামটা কি ভাই?

গোপাল—(লজ্জিত) আমি…আমার নাম…আর কোন দিন সিটি দেব না মাষ্টার মশাই!

সুরথ—তা সিটি দেবে বই কি। নিশ্চয়ই দেবে। তবে পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা—আর সিটির সময় সিটি। কেমন ?

গোপাল—হ্যাঁ।

সুরথ—তা'লে কি বলছিলাম, হ্যাঁ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা। তোমরা যখন কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যাও, চান করে পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পর কেন বল ত ?

বাবলু—পরিচ্ছন্ন থাকলে মনে ফুর্তি হয়।

সুরথ—ঠিক কথা। এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব।

ছেলেমেয়ে সবাই—আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব।

সুরথ—আমরা সাফাই করব।

সবাই—আমরা সাফাই করব।

৯

(পণ্ডিতের পাঠশালা। দুপুর গড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু একটা ছেলেও আসেনি। হুঁকো হাতে পণ্ডিত পায়চারি করছে।)

পণ্ডিত—তাই ত! ছেলেরা এখনো এল না। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

(অবশেষে ভোলাকে দরজায় দেখা গেল। কাঁদো কাঁদো মুখ। পণ্ডিত তাকে তেড়ে মারতে যায় আর কি।)

পণ্ডিত—তবে রে গর্দ্দভ! দুপুর গড়িয়ে পড়ল—পাঠশালায় আসার নাম নেই। ছিলি কোথায় এতক্ষণ, এ্যাঁ। মিছেকথা বললে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। বলি আর সব ছেলেরা কোথায় ?

ভোলা—কেউ এল না মামাবাবু! আমাকে ভেংচি কেটে সবাই নতুন পাঠশালায় চলে গেল।

পণ্ডিত—নতুন পাঠশালায় চলে গেল! (বসে পড়ল) সবাই চলে গেল! এতদিন পড়ালেখা শেখালুম, মানুষ করলুম—আজ যাবার আগে মুখের কথাও বলে গেল না! বিশ্বাস-ঘাতকের দল! (ভোলাকে) তোকেই বা কে আসতে বলেছে এখানে। দূর হয়ে যা এখান থেকে। দূর হ'—

(পণ্ডিতের দিকে ভোলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পণ্ডিত নিজেকে সামলে নেয় পরক্ষণেই।)

পণ্ডিত—(আদর করে) ভোলা! নিজের যায়গায় এসে বস বাবা! সবাই গেছে, তবু তুই আমাকে ফেলে যাসনি, এই আমার সান্ত্বনা। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ফিরে আসে ভাল, না আসে পরোয়া করব না। আমি শুধু তোকে নিয়েই পাঠশালা চালাব, হ্যাঁ! আজ থেকে তুই আমার পাঠশালার সবেধন নীলমণি!

১০

(সকালবেলা। বারান্দায় বসে রাখাল হুঁকো টানছে। রাখালের ছেলেমেয়ে বুবু আর টুবু একপাশে বসে মুড়ি খাচ্ছে।)

রাখাল—(চিন্তিত) টাকা টাকা টাকা! মহাজনের তাগিদে পাগলা হয়ে গেলাম। এদিকে বাজারে তাঁতের গামছার চাহিদা নেই। কি যে করি!

রাখালের স্ত্রী—(প্রবেশ করে) কিছু বলছ গো!

রাখাল—না। ভাবছি এমন করে আর কদিন চলে।

রাখালের স্ত্রী—কেন ভাবছ? মনখারাপ করে কি লাভ? যাঁর সংসার তিনিই চালাবেন। যাই, পুকুর-ঘাটে বাসন-পত্র রয়েছে।

(সে চলে গেল। মহাজন প্রবেশ করে)

মহাজন—এই যে রাখাল, বলি আমার পাওনা শোধ করবে কি না, আমি শেষকথা জানতে চাই।

রাখাল—আমার অবস্থা ত সবই জানেন। আরো কিছুদিন সময় আমাকে দিতে হবে মহাজন! (হাত জোড় করল)

মহাজন—সময় দেব! ঠক-জোচ্চর সব! টাকার তাগিদ দিলে সবাই ঐ এককথা বলে—সময়। বলি সব খরচই ত চলছে। মহাজনের টাকা শোধবার বেলা অবস্থা তোমাদের খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা বেশ, সুদের টাকাটা ফেলে দাও।

রাখাল—হাত একেবারে খালি। সাতটা দিন সময় দিন। সুদের টাকা আমি মিটিয়ে দেব।

মহাজন—সাতদিন! সাতদিনের ভেতর তুই কেমন করে টাকা যোগাড় করবি আমায় বলতে পারিস? দ্বারিক মহাজন ওসব ফাঁকা কথায় ভুলবে না।

(ইতিমধ্যে রাখালের বাছুর মনা উঠানে এসে দাঁড়াল। মনা বুবু টুবুর প্রিয় বন্ধু। ছুটে গিয়ে তারা মনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল: মনা! মনারে! দ্বারিকের দৃষ্টি পড়ল মনার উপর।)

মহাজন—বাঃ! বাছুরটা দেখতে ত বেশ পয়মন্ত!

(কাছে গেল। মনা ছোট্ট শিং নেড়ে প্রতিবাদ জানায়।)

তেজ আছে বটে। তা বলছিলাম কি রাখাল, হাজার হোক তুই প্রতিবেশী। নালিশ করে তোর ঘটিবাটী বার করে নীলেমে চড়াব—একি আমারই ভাল লাগবে।

রাখাল—আপনার দয়া মহাজন!

মহাজন—বলছিলাম কি সুদের টাকার বদলে বাছুরটাকে আমি নিয়ে যাই।

বুবু } —মনাকে দেব না,
টুবু }   কক্ষনো না।

রাখাল—তা আপনি মনাকে চাইছেন. সে ত আমার পরম ভাগ্যি। কিন্তু এরা দুটি যে মনাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারে না।

মহাজন—(রেগে গেল) বেশ বেশ! মন আমার নরম, ভাবলাম, টাকা যখন তোর নেই, বাছুরটাই নিয়ে যাই। অমন অনেক বাছুর বাজারে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, কাল সকালে সুদের টাকা কটা দিয়ে যাস্। তা না হলে পশু´ নালিশ করব। আমি চললাম।

(চলে গেল।)

বুবু } —মনা আমাদের, কাউকে দেব না—
টুবু }   কাউকে দেব না।

রাখাল—না দিয়ে উপায় কি বাবা! মহাজনের সুদের টাকা শুধব কেমন করে।

বুবু } —(কাঁদো কাঁদো) বাবা!
টুবু }

রাখাল—তোদের জন্য হাট থেকে খুব সুন্দর একটা গোরু কিনে আনব। তার নাম হবে সোনা!

বুবু—চাইনে তোমার সোনা !

(বুবু টবু মনার আসন্ন-বিরহের সম্ভাবনায় কাঁদতে লাগল।)

রাখাল—আচ্ছা আচ্ছা, দেব না মনাকে। কাঁদিসনি তোরা। দেখি টাকা কটা যোগাড় করতে পারি কি না।

(রাখাল চলে গেল।)

(উঠানের কোণে রাঙাজবার গাছ। বুবু একটা ফুল পেড়ে নিলে। তার শিশুমনে অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল।)

বুবু—গাছে টাকা ফলে না দিদিভাই ?

টুবু—দূর বোকা! এ ত ফুলগাছ। টাকা ত হয় টাকার গাছে।

বুবু—মহাজনের বাড়ীতে টাকার গাছ আছে, না রে টুবু ?

টুবু—আছেই ত।

বুবু—তুই দেখিস, বড় হলে বাড়ীতে টাকার গাছ পুঁতব আমি। অনেক টাকা ফলবে আমাদের গাছে।

(রাখালের স্ত্রী বাসন নিয়ে ফিরে এল। ছেলেমেয়ের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে সে।)

রাখালের স্ত্রী—সত্যি নাকি রে বুবু! ওরে বোকা ছেলে, গাছেই যদি টাকা ফলত, গরীবদের কি আর কোন অভাব থাকত রে!

বুবু—গাছে টাকা ফলে না, তবে কোথায় ফলে মা ?

মা—তা জানিনে বাবা! এ-সব কথা বই-এ লেখা আছে। আমি ত আর পড়তে জানি নে। তোরা লেখাপড়া শেখ, তখন টাকা কোথায় তৈরী হয় সব জানতে পারবি।

১১

(পাঠশালা। পণ্ডিত হুঁকো টানছে। সবেধন নীলমণি ছাত্র ভোলা বই খুলে বসে আছে।)

পণ্ডিত—পড়্ হতভাগা, পড়্। লেখাপড়া শিখলি না, কি করে খাবি এঁ্যা !

(ভোলা সুর করে পড়তে লাগল)

ভোলা— টাকা মানে টঙ্কা।
টাকা মানে টঙ্কা।
টাকা মানে টঙ্কা।
টঙ্কা মানে কি মামাবাবু ?

পণ্ডিত—এঁ্যা ! টঙ্কা ? টঙ্কা মানে টাকা।

ভোলা—(সুর করে) টঙ্কা মানে টাকা।
টঙ্কা মানে টাকা।
টঙ্কা মানে টাকা।
টাকা মানে কি মামাবাবু ?

পণ্ডিত—(বিরক্ত) এমন বোকা ছেলে ত দেখিনি। টাকা মানে জানে না। এতক্ষণ তবে কি শিখলি, এঁ্যা ? গর্দ্দভ ! টাকা মানে টঙ্কা—মানে তোমার গিয়ে যাকে বলে ধনদৌলত। বুঝলি, টাকা মানে ধন-দৌলত।

ভোলা— টাকা মানে ধন-দৌলত।
টাকা মানে ধন-দৌলত।
টাকা মানে ধন-দৌলত।
ধন-দৌলত মানে কি মামাবাবু ?

পণ্ডিত—আঃ ! জ্বালিয়ে মারলে দেখছি। এমন হাবাছেলে

জীবনে দেখিনি। পড়তে বসে খালি প্রশ্ন। ধন-দৌলত মানে টাকাকড়ি মানে তোমার গিয়ে টঙ্কা মানে ঐ একই কথা হল। অর্থাৎ টাকা। বারবার প্রশ্ন করিসনি, পড়তে হয়, পড়্।

(ভোলা সুর করে পড়তে লাগল)

ভোলা টাকা মানে ধন-দৌলত।
টাকা মানে ধন-দৌলত।
টাকা মানে ধন-দৌলত।

১২

(নতুন পাঠশালা। আমগাছের ছায়ায় ক্লাশ সুরু হয়েছে। সুরুচি ছেলেমেয়েদের বোঝাচ্ছে, টাকা জিনিসটা কি। কেন সবাই টাকা চায়। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে শুনছে।)

সুরুচি—ধন-দৌলত? না, টাকা মানে সত্যিকার ধন-দৌলত নয়। আচ্ছা, তোমাদের বুঝিয়ে বলছি। এই যে চরখা, এটা আমরা আটটাকা পাঁচ আনা দিয়ে কিনেছি। যদি টাকা না থাকত, কি হত তা'হলে?

বাবলু—টাকার বদলে ধান দিয়ে আমরা চরখাটা নিতুম।

সুরুচি—ঠিক কথা। কিন্তু চরখাওয়ালার হয়ত ধানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তার কাপড়ের। অথচ আমাদের ধান আছে, কাপড় নেই। তখন কি হত?

গোপাল—আমরা তখন কাপড়ের মালিককে ধান দিয়ে কাপড় নেব প্রথমে। তারপর কাপড় দিয়ে চরখা আনব।

সুরুচি—ঠিক তাই। কিন্তু এর অসুবিধাও অনেক। ঐ অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আবিষ্কার করলেন টাকা। টাকা, যার বিনিময়ে প্রত্যেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বাজার থেকে পেতে পারে। হ্যাঁ, টাকা দিয়ে সবই কিনতে পারা যায়—খাবার জিনিস, পরবার জিনিস—আরও কত কি।

গোপা—সে কথা সত্যি।

সুরুচি—কিন্তু দেশে যদি ভাত-কাপড়ই না থাকে, টাকা দিয়ে তুমি কিনবে কি?

বাবলু—কিচ্ছু না।

সুরুচি—সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টাকার নিজস্ব কোন দাম নেই। টাকা আমরা খেতে পারি না—পরতে পারি না। আর দেশে যদি খাবার পরবার অভাব না থাকে, যদি মাঠে প্রচুর ধান জন্মে, তাঁতে প্রচুর কাপড় তৈরী হয়—কি প্রয়োজন আমাদের টাকাকড়ির?

বাবলু ও অন্যান্য—সত্যিই ত! টাকাটাই বড় নয়।

১৩

(গ্রামের রাস্তা। দুপাশে গাছ-গাছড়া আগাছা ভর্ত্তি। মহাজনের বাড়ী পেছনে। মহাজন ও পণ্ডিত রাস্তার ধারে বসে কথা বলছে।)

মহাজন—টাকাকড়ি যা ছিল, সব মেরে দিয়ে চাষীরা আজকাল এ-পথ দিয়ে চলাফেরা বন্ধ করেছে পণ্ডিত!

পণ্ডিত—তা না করে উপায় কি? ওদের দেখলেই তুমি ডাকাডাকি বকাবকি কর।

মহাজন—বটে? তবে কি ডেকে এনে আর এক দফা টাকা ধার দেব? তোমার যেমন কথা! আধপেটা খেয়ে, টাকা জমিয়ে ওদের ধার দিয়েছি। সেই টাকা আমার, ওরা ফিরিয়ে দিচ্ছে না।

(রাখাল তাঁতি মনাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছে। মহাজন দেখতে পায়।)

মহাজন—দেখছ, দেখছ পণ্ডিত! বেইমান রাখালের কাণ্ড দেখছ।

পণ্ডিত—কি হল!

মহাজন—আরে, তুমি কি কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। (চেঁচিয়ে ডাকল) এই রাখাল! বাছুরটাকে হাঁটে নিয়ে চললি! ভেবেছিস বেচে দিয়ে, আমার পাওনা টাকা কটা মেরে দিবি, এঁ্যা! কথা বলছিস না কেন রে, এই রাখাল!

(ততক্ষণে রাখাল মহাজনের কাছে এসে পড়েছে। আনত হয়ে সে নমস্কার করল।)

রাখাল—(ম্লান হেসে) বলেন কি মহাজন! আমার ঘরের লক্ষ্মী মনাকে বাজারে বেচব? না মহাজন, ওকে আপনার কাছেই নিয়ে এলাম। (ছাবিক খুসী) আজ থেকে মনা আপনার।

মহাজন—সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে! তা বেশ, তা বেশ। বিয়োতে ত এখনো বছরখানেক বাকী। তা আমি তোর মনাকে যত্নে রাখব। (মনাকে আদর করে) বাছুরটা দেখেই কেমন মনে লাগল। তা না হলে করকরে টাকার বদলে কে ওকে নেবে, বল্! আচ্ছা তুই যা।

(রাখাল নমস্কার করে চলে গেল। মহাজন পণ্ডিতের দিকে ফিরলে।)

মহাজন—বুঝলে পণ্ডিত, কেন মনাকে আনলাম ?…দুধ খাব, দুধ। দুধের যা দাম আজকাল, কিনে খেতে গেলেই দেউলে আর কি !

পণ্ডিত—তোমার মাথা খারাপ ! আচ্ছা আজ আসি।

(পণ্ডিত চলে গেল। মহাজন মনাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল।)

(সুরুচি একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে রাস্তার ধারে জঙ্গল কাটতে লাগল। সুরুচি পেছনে, ছেলেরা আগে। মহাজন ছেলেদের দেখতে পেয়ে তেড়ে মারতে এল।)

মহাজন—(এগিয়ে এসে) তবে রে ছুঁচোর দল ! দলবল নিয়ে দিনদুপুরে এসে আমার গাছ-গাছড়া কেটে নিচ্ছিস—আস্পর্দ্ধা ত কম নয় তোদের !

বাবলু—(শান্তস্বরে) নমস্কার মহাজন ! এ-সব জঙ্গল আর ডোবা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার ডিপো। গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া তাড়াব বলে আমরা রাস্তাঘাট সাফাই করতে বেরিয়েছি।

মহাজন—তবে আর কি—আমার মাথা কিনেছিস ! কথা শুনে পিত্তি জলে যায়। বলি আমার জঙ্গল আমি সাফাই করতে দেব না, আমার ডোবা আমি ভরাট করব না, আমার রাস্তা আমি মেরামত করব না !

গোপাল—আমার পাঁঠা আমি ল্যাজে কাটব !

মহাজন—হ্যাঁ, তাই কাটব। বলি তোদের মাথাব্যথাটা কিসের —এ্যাঁ !

(সুরুচি এগিয়ে এল)

সুরুচি—মহাজন !

মহাজন—ইনি আবার কে। ও! মাষ্টারণী!

সুরুচি—আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। সমাজে বাস করতে হলে যেমন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, তেমনি গাঁয়ে বাস করতে হলে সাধারণের ভালর জন্য রাস্তাঘাট আপনাকে পরিষ্কার রাখতে হবে।

দ্বারিক—চমৎকার! আমারই জমিতে দাঁড়িয়ে আমাকেই কি না চোখ রাঙানো হচ্ছে। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি তোমাদের কোন নিয়ম মানব না। কোন কথা শুনব না। হ্যাঁ—

(দ্বারিক বেরিয়ে গেল সুরুচি ও অন্যান্য সবাই আগাছা পরিষ্কার করতে লাগল।)

১৪

(রাখালের বাড়ীর দাওয়া ও উঠান। সন্ধ্যা। বুবু ও টুবু বসে বসে কাঁদছে।)

বুবু—দিদি ভাই রে! মনা আর আসবে না রে দিদি ভাই?

টুবু—বুড়ো বেঁধে রেখেছে যে!

(এমন সময় দেখা গেল মনা তাদের দিকে আসছে। মোঁ-উ-উ! তারা ফিরে তাকাল।)

বুবু }
টুবু } —মনা! মনা এসেছে!

টুবু—চেঁচাস নি। বুড়ো এক্ষুনি ওকে নিতে আসবে।

বুবু—কি হবে দিদি ভাই!



সুরুচি, সুরথ ও পরেশবাবুর ভূমিকায় শোভা সেন, অভী ভট্টাচার্য ও
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য





(বুবু ও টুবু পরস্পরের কাণে কাণে কি বললে। তারপর মনাকে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনের বারান্দার দিকে গেল। মা তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে গড় করলে।)

মা—বুবু টুবু! সন্ধ্যাবেলা কোথায় রে তোরা! ঘরে আয় বলছি!

বুবু-টুবুর গলা ভেসে এল—যাই মা।

মা—শীগগির আয়।

(মা ঘরে গেল। পরক্ষণেই মহাজন লণ্ঠন হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।)

মহাজন—রাখাল বাড়ী আছ, ও রাখাল!

(তাঁতের ঘর থেকে বাবলু বেরিয়ে এল।)

বাবলু—বাবা নেই ত!

মহাজন—বাড়ী নেই! তোদের বাছুরটা আমায় জ্বালিয়ে মারলে। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে আবার। এখন বাছুর সামলাব, না খাতক সামলাব, না বাগানবাড়ী সামলাব! কি বিপদেই না পড়েছি!

(রাখালের স্ত্রী বেরিয়ে এল ঘোমটা টেনে।)

রাখালের স্ত্রী—মনা ত আমাদের বাড়ীতে আসেনি।

বাবলু—একটু আগে আমি মনাকে বড়রাস্তায় দেখেছি।

মহাজন—দেখেছিস! দেখেও আটকালি না! তা কেন আটকাবি। এখন ত আর ওটা তোদের নয়। চুরি গেলেই বা কি, আর হারিয়ে গেলেই বা কি। কি দুর্মতিই না আমার হয়েছিল! করকরে টাকার বদলে বাছুর নিলাম, এখন বাছুরও গেল—টাকাও গেল।

(বলতে বলতে মহাজন যেই না রাগের মাথায় হাত ঝাঁকুনি দিয়েছে হাত থেকে লণ্ঠনটাও গেল পড়ে।)

মহাজন—গেল! চিমনিটা গেল! কি লোকসানের বরাত আমার।

(মহাজন হন হন করে বেরিয়ে গেল বুবু ও টুবু আস্তে আস্তে মার কাছে এসে দাঁড়াল।)

রাখালের স্ত্রী—বুবু টুবু, মনাকে রান্নাঘরের পেছনের বারান্দায় লুকিয়ে রাখিস নি ত?

(মার কথা শেষ হতে না হতেই বুবু টুবু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।)

বাবলু—হুঁ। আমিও ত বলি…

(বাবলু বেরিয়ে গেল। বুবু টুবু কাঁদছে।)

রাঃ স্ত্রী—এই ভর সন্ধ্যেবেলা কাঁদিস্ নি তোরা! মনার মালিক এখন মহাজন। আটকে রাখলে চলে কখনো! তবু কাঁদে!

(বাবলু রান্নাঘরের বারান্দা থেকে মনাকে নিয়ে এল।)

বাবলু—চল মনা, তোকে মহাজনের বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। খবরদার! আর কোনদিন এ-বাড়ীতে আসবিনি।

(তার গলা ধরে এল! ছোট ভাইবোন বুবু টুবুর মত মনাকে সে-ও ভালবাসে। মনা এ-পরিবারেরই একজন। বাবলু মনাকে নিয়ে চলে গেল। বুবু-টুবু কাঁদছে।)

মা—তবু কাঁদে! মনা যদি সত্যি সত্যি তোদের হয়, গোপালঠাকুর নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন। আয়, ঘরে আয়।

(মা বুবু-টুবুর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।)

১৫

(পথের ধারে গোপালঠাকুরের গাছ। গাঁয়ের লোক প্রায়ই গোপালঠাকুরের কাছে মানত করে। কারো গোরু হারিয়েছে, অমনি গোপালঠাকুরকে পাঁচটা কলা দিতেই গোরুটি ফিরে এল। এমনি

কত কি। বুবু-টুবু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, গোপালঠাকুরের গাছ দেখে থমকে দাঁড়াল।)

বুবু—দিদিভাই রে!

টুবু—আয় না, ঠাকুরকে বলি আমাদের মনাকে ফিরিয়ে দিতে।

বুবু—ঠাকুর মনাকে ফিরিয়ে দেবেন?

টবু—হ্যাঁ। মার রূপোর আংটি হারিয়েছিল না? ঠাকুরই ত খুঁজে দিলেন।

বুবু—আমরা ঠাকুরকে পেয়ারা দেব।

(এগিয়ে এসে তারা বেদীর নীচে বসল। হাত জোড় করে ঠাকুরকে বলতে লাগল)

বুবু ও টুবু—ঠাকুর! তুমি আমাদের মনাকে এনে দাও!

বুবু—(বাধা দিয়ে) দিদিভাই রে!

টুবু—আবার কি হল!

বুবু—কী লাভ! ঠাকুর ত মনাকে ফিরিয়ে দেবেন, মহাজন বুড়ো আবার এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

টুবু—দূর বোকা! ঠাকুর দিলে কি কেউ নিতে পারে!

বুবু—ও!

(তখন তারা আবার একসঙ্গে বলতে লাগল।)

বুবু-টুবু—ঠাকুর আমাদের মনাকে এনে দাও! তোমাকে দুটি পেয়ারা দেব। মা বলেছে, তুমি খুউব ভাল। ছোটদের তুমি খুউব ভালবাস। আমরা আর কিচ্ছু চাইনে ঠাকুর! শুধু মনাকে চাই।

(তাদের চোখে জল এসে পড়েছে).

তোমার দুটী পায়ে পড়ি ঠাকুর! মনাকে ফিরিয়ে দাও! মনাকে ফিরিয়ে দাও!

(কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়ল। গাছে হাওয়া ছুটল। ফুল ঝরে পড়ছে। এদিকে মনা বুবু-টুবুদের খোঁজে খোঁজে শেষকালে গোপালঠাকুরের গাছের তলায় এসে উপস্থিত। জিভ দিয়ে বুবু-টুবুদের সে চাটতে লাগল। ম্যাঁউ-উ! ঘুম ভেঙ্গে গেল তাদের।)

বুবু
টুবু } মনা! মনা এসেছে দিদি ভাই!

(জড়িয়ে ধরল তারা বন্ধুর গলা।
পেছনে লাঠি হাতে মহাজন।)

মহাজন—আবার তোরা মনাকে ডেকে এনেছিস্? না, আর পারি না। কাজকর্ম সব শিকেয় উঠল। বলি বাছুরটার মালিক কে? আমি না তোমরা?

বুবু—আমরা। আমি আর দিদিভাই।

মহাজন—কি বেহায়া ছেলেমেয়ে! বলি, তোর বাবা মনাকে আমার কাছে বেচে দেয় নি?

টবু—বাবা দিয়েছিল, ঠাকুর আবার ফিরিয়ে এনেছে।

মহাজন—আ মলো। ঠাকুরের খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তোদের জন্ম গরু চুরি করে বেড়াচ্ছে আজকাল।

বুবু—ঠাকুর চুরি করবে কেন! তুমিই ত আমাদের মনাকে চুরি করে নিয়ে গেছ।

মহাজন—আমাকে চোর বলছিস। আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। বেরোও এখান থেকে। (লাঠি তুললে। বুবু-টুবু অচঞ্চল) দূর হ', নইলে··· এ যে নড়েও না। একটু ভয়-ডরও নেই।

বুবু—ঠাকুর আমাদের, ভয় করব কেন? তুমি এখান থেকে চলে যাও।

মহাজন—আমি চলে যাব? বেশ। আয় মনা, আমরা বাড়ী যাই।

(মনার গলার দড়ি ধরে টানতে লাগল। কিন্তু মনা কিছুতেই যাবে না। বিরক্ত মহাজন কষে লাগাল এক ঘা। আর যাবে কোথায়। বুবু-টুবু এমনভাবে চেঁচাতে সুরু করল, যেন তারাই মার খেয়েছে। সাবডিপুটী সাইকেলে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নেমে এল।)

বুবু-টুবু— { বাবারে! মেরে ফেললে রে! মেরে ফেললে রে!

সবডিপুটী (প্রবেশ করে)—হল কি?

মহাজন—হাকিমসা'ব সেলাম। এরা রাখাল তাঁতির ছেলেমেয়ে হুজুর! দেনার দায়ে রাখাল গরুটা আমার নিকট বিক্রী করেছে। বাছুরটার উপর ওদের কোন দাবীদাওয়া নেই। এই সহজ কথাটা আপনি ওদের বুঝিয়ে দিন্ না হুজুর!

সবডিপুটী—তোমাদের বাবা বাছুরটা মহাজনের কাছে বিক্রী করেন নি? (বুবু-টুবু ফোঁপাচ্ছে)

মহাজন—দেখছেন ত কেমনধারা বেহায়া ছেলেমেয়ে হুজুর, কথার উত্তর দেয় না!

সাবডিপুটী—হুঁ। বাছুরটা আপনি নিয়ে যান।

মহাজন—সালাম হুজুর। আপনার কাছে ন্যায়বিচার পাব, এ আর বেশী কথা কি! আয় মনা! হুজুর রায় দিয়েছেন। তুই আমার। (মনা কিন্তু কিছুতেই যাবে না) আয় মনা, আয়! (হাতের

দড়ি আল্‌গা হতেই মনা বুবু-টুবুর কাছে চলে গেল।) তবে রে হতভাগা বাছুর!

. সাবডিপুটী—আসুন! মনার মালিক আপনি নন এর পরেও একথা আমাকে বলে দিতে হবে?

মহাজন—এ যে দেখছি কাজীর বিচার। আপনি আমায় হাসালেন হুজুর! হি হি হি! আয় মনা, আয়!

সাবডিপুটী—আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। রাখালের ঋণের দায়ে নাবালকের সম্পত্তি মনাকে কেড়ে নেবার কোন অধিকার নেই আপনার!

মহাজন—ও!

(হতাশভাবে বারেক মনার দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। বুবু-টুবু ভয়ে ভয়ে সাবডিপুটীর দিকে তাকায়। সাবডিপুটী স্মিতমুখে মাথা নাড়ে।)

সবডিপুটী—মনাকে নিয়ে তোমরা বাড়ী যাও।

বুবু-টুবু— মনা আমাদের, কি মজা,
আয় মনা! বাড়ী আয়!

বুবু—ঠাকুরকে পেয়ারা দিতে হবে কিন্তু দিদিভাই!

টুবু—দেবই ত।

(তারা যেতে লাগল মনাকে নিয়ে। সাবডিপুটি দাঁড়িয়ে দেখছে।)

১৬

(বুনিয়াদী বিদ্যালয়। ছেলেমেয়েরা চরকা ও তকলি কাটছে। ভেতর থেকে তাঁত চালানোর শব্দ আসছে। ওদের দলে সুরথ ও সুরুচি রয়েছে। পটভূমিকা থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছে।)

এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্।
নব ভারতের মুক্ত সেনানী দল
চল্রে, এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্।

(গান বন্ধ হল। আস্তে আস্তে সুরথ সামনে দর্শকদের ঠিক মুখোমুখি এগিয়ে এল।)

সুরথ—আমাদের নতুন পাঠশালা সম্বন্ধে আপনারা জানতে চেয়েছেন। কেননা নতুন পাঠশালা রাঙামাটী গ্রামে নব-জীবনের সাড়া এনেছে। আপনারা ত জানেন, এখানে এমন কোন এক হাতের কাজের ভেতর দিয়ে শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়, যার সঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশের যোগাযোগ আছে। তাই জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে।

কৃষি ও গোপালন নতুন পাঠশালার একটা প্রধান কারুশিল্প। পাঠশালার গোশালে যা দুধ হয়, তাতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই রোজ আধসের করে টাটকা দুধ খেতে পায়।

পাঠশালার বাগানে বিজ্ঞানসম্মত সার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা প্রচুর শাকসব্জী ও ফল উৎপাদন করে। নিজেদের চাহিদা ত ওতে মিটেই, উপরন্তু হাটে সব্জী বিক্রী করে কিছু আয়-ও হয়।

সুতো কাটা নতুন পাঠশালার একটা প্রধান কারুশিল্প। এগার বছরের শিশুরা প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ তার বা একলাটি সুতো কাটতে পারে। এ-বয়সে শিশুদের সুতো কাটার গড়পড়তা গতি, ঘণ্টা প্রতি ২০ তার বা আধগুণ্ডী। এই হারে দৈনিক আধ ঘণ্টা করে সুতো কাটলে বছরে তারা ৯০ গুণ্ডী সুতো কাটতে সমর্থ।

সাধারণত বার থেকে ষোল নম্বরের সুতো এই বয়সের শিশুরা

কাটে। এই সুতোর ৪ গুণ্ডীতে এক বর্গ গজ কাপড় তৈরী হয়। এই হিসাবে ৯০ গুণ্ডীতে সাড়ে বাইশ গজ কাপড় তৈরী হয়। সাড়ে বাইশ গজ কাপড়, আমাদের শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

বার থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থী সাধারণত চার ঘণ্টায় এক বর্গ গজ কাপড় বুনতে পারে। এই হিসাবে সাড়ে বাইশ গজ কাপড় বুনতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে সাড়ে সাত ঘণ্টা অথবা দৈনিক পনের মিনিট কাজ করতে হয়।

সুতরাং কার্পাস চয়ন, তুলো ধোনা, প্যাজ করা, সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজে গড়পড়তা দৈনিক এক ঘণ্টা করে ব্যয় করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ব্যবহারের কাপড় নতুন পাঠশালা থেকে পাবে।

নতুন পাঠশালার ছেলেমেয়েরা গ্রামের রাস্তাঘাট, জলাশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ছাত্র-ছাত্রীরা দৈনন্দিন জীবন-যাপনে পরস্পর সহযোগী ও আত্মনির্ভরশীল।

হ্যাঁ, এই আত্মনির্ভরশীলতাই নতুন পাঠশালার আদর্শ।

নাচ গান উৎসব, একটা আনন্দময় পরিবেশ ও ছুটীর আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জ্জন করে।

(সুরথ অভিবাদন করে বসে চরখা চালাতে লাগল। পটভূমিকায় গান শোনা গেল)

১৭

দৃশ্য পরিবর্ত্তন হল। ছাত্র-ছাত্রীরা বনভোজনে যাচ্ছে।

দূরের বাঁশী ডাক দিল আজ ছুটীর নিমন্ত্রণে—
প্রাণের নিমন্ত্রণে যে আজ পথের নিমন্ত্রণে।

স্বপ্ন ঝরে—
স্বপ্ন ঝরে তাই ত চোখে, স্বপ্ন ঝরে মনে,
ছুটীর নিমন্ত্রণে।
মেঘের সাথে চলব ছুটে
হারিয়ে যাওয়ার ভাবনা টুটে গো
পিছন পানে চাইব নাক
সামনে চলার পানে
ছুটীর নিমন্ত্রণে।*

১৮

(গ্রামের রাস্তা। মাদুর পেতে বসে পণ্ডিত ভোলাকে পড়াচ্ছে। কিন্তু ভোলার আজ মন-মেজাজ ভাল নয়। বই সামনে রেখে সে নীরবে কাঁদছে।)

পণ্ডিত—এই তিন বছর—তিনটা বছরে কি শিখলি হতভাগা, এ্যাঁ কি শিখলি! কিচ্ছু না।...তা কাঁদছিস কেন? পেট ব্যথা করছে? পড়াশুনা যে তোর কোন কালে হবে না, আমি জানি!...তবু কাঁদে! কী বিপদ! আমি জানব কেমন করে? বল্ না ছাই, কি হয়েছে!

ভোলা—(কাঁদো কাঁদো স্বরে) আমি নতুন পাঠশালায় যাব।

পণ্ডিত—কি, কি বললি?

(দূরে মহাজন ও কবিরাজকে আসতে দেখে পণ্ডিত চেপে গেল। তারা কথা বলতে বলতে আসছে।)

কবিরাজ—তখনি তোমাকে বলেছিলাম, ধার ওদের দিয়ো না মহাজন! তুমি ত আমার কথা শুনলে না সেদিন।

* সমীর ঘোষের লেখা।

মহাজন—মন আমার নরম, কারো অভাব অনটন দুঃখকষ্ট দেখে চুপ করে থাকতে পারি না। তাই আজ এই অবস্থা। ঘরের টাকা বের করে দ্বারে দ্বারে তাগিদ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ একটা পয়সা-ও ফেরত দিচ্ছে না। যত সব বেইমানের দল!

কবিরাজ—এই যে পণ্ডিত! আজকাল তোমাকে দেখতেই পাইনে। পাঠশালাও উঠে গেছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়ে সব নতুন পাঠশালায় যাচ্ছে। সারাদিন কোথায় থাক হে?

পণ্ডিত—বাড়ীতেই থাকি।

মহাজন—গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাগুলো আজকাল কেমন বেপরোয়া বুক ফুলিয়ে হাঁটে। সমীহ করা দূরে থাক্, যেন তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিতে চায়।

কবিরাজ—তা ত হবেই। নতুন পাঠশালায় শিক্ষা পাচ্ছে—আমাদের ওরা গ্রাহ্য করবে কেন বল! বলি পণ্ডিত, যারা তোমার পাঠশালা উঠিয়ে দিয়ে এত বড় সর্ব্বনাশটা করলে, তাদের প্রতি কি কোন কর্ত্তব্য নেই তোমার?

পণ্ডিত—আমি কি করতে পারি?

কবিরাজ—প্রতিশোধ নাও! (চুপি চুপি) পরেশবাবুর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দাও। নতুন পাঠশালা পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। হা হা হা!

পণ্ডিত—না না না…এ তুমি কি বলছ! এ তুমি কি বলছ!

মহাজন—পণ্ডিতের মাথায় এ-সব মতলব কেন ঢুকিয়ে দিচ্ছ কবরেজ! শেষকালে সত্যি সত্যি না একটা কেলেঙ্কারি করে বসে!

পণ্ডিত—(উঠে দাঁড়ান) কেলেঙ্কারির ভয় নেই মহাজন, পণ্ডিত পাগল নয়। আর তোমরাও যাতে পাগলামো না করতে পার আমি সে ব্যবস্থাই করছি। (ভোলাকে) আয় ভোলা আমার সঙ্গে।

ভোলা—মামাবাবু!

পণ্ডিত—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা নতুন পাঠশালায় যাব রে গাধা!

(পণ্ডিত ভোলার হাত ধরে যেতে লাগল। কবিরাজ ও মহাজন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে।)

মহাজন—ক্ষেপে গেলে নাকি পণ্ডিত! ঠাট্টাও বোঝ না! যেয়ো না, শোনো—কথা শোনো।

কবিরাজ—নতুন পাঠশালায় চলে গেল।

১৯

(বুনিয়াদী বিদ্যালয়—নতুন পাঠশালা। সুরথ সুরুচি বারান্দায় বসে তকলি কাটছে।)

সুরুচি—বাবা কাল আসছেন, মনে আছে ত?

সুরথ—নিশ্চয়ই। ভোর ছ'টায় উঠে দুজনে ইস্টিশানে চলে যাব বাবাকে আনতে। পণ্ডিত মশাই!

(পণ্ডিত ও ভোলা এল)

সুরুচি—পণ্ডিত মশাই এসেছেন!

পণ্ডিত—মানে ভোলাকে নতুন-পাঠশালায় ভর্ত্তি করবার জন্য……

সুরুচি—নিশ্চয়ই ভর্ত্তি করব ভোলাকে। এস ভোলা! (কাছে টানলে)

সুরথ—আপনি বসুন।

পণ্ডিত—(বসে) আমারই দোষে ওর জীবনের তিনটা অমূল্য বৎসর নষ্ট হয়েছে। যাকগে সে-কথা। ভোলাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাই।

সুরথ—গাঁয়ের সব ছেলেই নতুন পাঠশালায় এল। এল না শুধু একজন। আজ সেও এসেছে! বড় আনন্দের দিন আজ। ভোলার সব দায়িত্ব আমরা নিলাম পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত—(খুশী) আমি জানতাম।

সুরথ—আপনাকেও কিন্তু নতুন পাঠশালায় যোগ দিতে হবে, অবসর গ্রহণ করলে চলবে না।

পণ্ডিত—আমি! কিন্তু তোমাদের নতুন পাঠশালার শিক্ষা-পদ্ধতির কিছুই ত আমার জানা নেই সুরথ!

সুরুচি—ভাবছেন কেন! আমরা আপনাকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে ট্রেনিংএ পাঠাব।

পণ্ডিত—ট্রেনিংএ যাব? তোমার গিয়ে···দাঁড়াও মা, ভেবে দেখি··· ভেবে দেখি! বয়স হয়েছে, তা হোক। কিন্তু সুযোগ পেলে এখনো শিখতে পারি। হ্যাঁ, ট্রেনিংএ আমি যাব বই কি মা!

সুরথ—বাবলু!

বাবলুর গলা—যাই দাদাবাবু।

সুরথ—ভোলা এসেছে।

(বাবলু ছুটে এল।)

বাবলু—ভোলা! পণ্ডিত মশাই!

(পায়ের ধুলো নিলে)

পণ্ডিত—হয়েছে বাবা—থাক। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

বাবলু—আয় ভোলা।

(ভোলাকে নিয়ে ভেতরে গেল)

সুরথ—মহাজনকে বলে নতুন পাঠশালার জন্য ফুলবিহার বাড়ীখানির ব্যবস্থা করে দিন্ না পণ্ডিত মশাই! উপযুক্ত দাম আমরা দেব।

পণ্ডিত—গিয়েছিলে ওঁর কাছে ?

সুরথ—তা গিয়েছিলাম। কিন্তু নতুন পাঠশালার নাম শুনে আমাদের তেড়ে মারতে এলেন।

পণ্ডিত—এতখানি আস্পর্দ্ধা ! বেশ, তবে জেনে রাখো, ফুলবিহারের মালিক দ্বারিক মহাজন নয়।

সুরুচি—বলেন কি পণ্ডিত মশাই !

পণ্ডিত—যথার্থ বলছি। অপুত্রক জমিদার ছোট ছেলেমেয়েদের কতখানি ভালবাসতেন, সে ত তোমরা জান। ফুলবিহার তিনি গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের উইল করে দান করে গেছেন।

সুরথ—বটে ?

সুরুচি—তা যদি হয়, দ্বারিক মহাজন কেমন করে ফুলবিহারের মালিক হয়ে বসল পণ্ডিত মশাই ?

পণ্ডিত—ধাপ্পাবাজি করে। জমিদারের মৃত্যুর পর ফুলবিহার দখল করে দ্বারিক রটিয়ে দিলে, পাওনা টাকার উপর সে ফুলবিহার নিয়েছে। কথাটা বলি বলি করেও এতদিন তোমাদের বলা হয়নি।

সুরুচি—হুঁ। তা'লে এই ব্যাপার। যাকগে, ইস্কুলবাড়ীর দুর্ভাবনটা ঘুচল বোধ হয়। ছুটীর ঘণ্টায় আজই ছেলেমেয়েদের ফুলবিহারের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

পণ্ডিত—ছেলেমেয়েরা কি করবে ?

সুরুচি—জানেন না বুঝি ? নতুন পাঠশালার কাজকর্ম্ম সব ওরা নিজেরাই করে। ওদের মতামত না নিয়ে আমরা কিছু করি না। ফুলবিহার সম্বন্ধেও ওদের মতামত আমরা চাইব।

পণ্ডিত—তা বেশ। আমি আদালতে যেয়ে হলফ করে বলব, দ্বারিকের পাই-পয়সাও পাওনা ছিল না জমিদারবাবুর কাছে, ধাপ্পা

দিয়ে সে ফুলবিহার দখল করেছে। আচ্ছা, আজ তা'লে আসি মা! কাল আবার আসব।

সুরথ—নিশ্চয়ই আসবেন।

(পণ্ডিত চলে গেল।)

২০

(সকাল বেলা। মহাজনের দাওয়া। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কবিরাজ কড়া নাড়ছে।)

ভেতর থেকে মহাজন—এই নিশুতি রাতে কে আমার দরজা ঠেলে ?

কবিরাজ—আমি কবরেজ।

মহাজন—কবরেজ ?

(দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

মহাজন—বেলা হয়ে গেছে যে !

কবিরাজ—সিন্দুকের ভেতর বসে টাকা গুনলে রাত দিনের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকবে কেন ?

মহাজন—টাকা ! কোথায় টাকা ? কাগজ, সব কাগজ। তুমি ত সবই জান কবিরাজ !

কবিরাজ—তা জানি। গাঁয়ের লোক ঠকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মহাজন, কপালে তোমার আরো দুর্ভোগ আছে। (গলা নামিয়ে) এইমাত্র কথাটা আমার কানে এল, গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নাকি আজ সকালেই জোর জবরদস্তি করে তোমার বাগান ফুলবিহার দখল করবে।

মহাজন—গায়ের জোরে ওরা আমার ফুলবিহার দখল করবে, দেশে কি ধর্ম্ম নেই; বিচার নেই !

কবিরাজ—ওরা দখল করতে চাইলেই বা তুমি দখল করতে দেবে কেন? কিন্তু আর সময় নষ্ট করো না মহাজন, যা করবার চটপট্ কর। এতক্ষণে হয়ত ওরা এসে পড়ল! ফুলবিহার একবার ওরা দখল করলে, আর ওদের সরাতে পারবে না।

মহাজন—তা আর জানিনে! ওরা ফুলবিহার দখল করবে এ-খবর আমি কালই পেয়েছিলাম। গাঁয়ের লোকদের কাছে গেলাম প্রতিবাদ জানাতে। তারা হেসেই উড়িয়ে দিলে কথাটা। তখন বাধ্য হয়ে—

(পণ্ডিত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল)

পণ্ডিত—শেষকালে গুণ্ডা দিয়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের তুমি খুন করাবে মহাজন! ছি ছি ছি!

মহাজন—হ্যাঁ, আমি ফুলবিহার পাহারা দেবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করেছি। কেন করব না। সুরথ তার দল-বল নিয়ে এসে আমার ফুলবিহার দখল করবে, আর আমি কিছুই বলব না, এই তুমি বলতে চাও পণ্ডিত?

পণ্ডিত—সুরথ! কোথায় সে? সুরথ আর সুরুচি ভোরবেলা ইস্টিশনে গেছে, পরেশ বাবুকে আনতে।

কবিরাজ—তাই নাকি! ছেলেদের ফুলবিহারে পাঠিয়ে দিয়ে সুরথ তা'লে পালিয়েছে।

পণ্ডিত—না কবরেজ, সুরথ পালায়নি। শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের পালাতে হবে। ফুলবিহারের মালিক তুমি নও, একথা কি তুমি আজো অস্বীকার করবে মহাজন?

কবিরাজ—বল কি? কথাটা ত জানতাম না।

মহাজন—এ সব কথার মানে?

পণ্ডিত—ভয় দেখাচ্ছ? এতদিন যা কিছু অন্যায় করেছি, ভয়ে নয়, চক্ষুলজ্জায়। আজ তুমি গুণ্ডা দিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের খুন করাতে চাইছ। কিসের চক্ষুলজ্জা তোমার সঙ্গে? আমি নিজে আদালতে যেয়ে বলব, তুমি জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ!

মহাজন—(করুণস্বরে) পণ্ডিত! পাঠশালার ব্যাপারে আমি তোমার পক্ষ নিইনি? সাধ্যমত সাহায্য করিনি তোমাকে সেদিন? আজ স্বরথের দলে যোগ দিয়ে তুমি তার প্রতিদান দিতে চাও? বেশ! আমার সর্ব্বনাশ করে যদি তোমার আনন্দ হয়, তাই কর, তাই কর পণ্ডিত।

পণ্ডিত—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না…আমি আদালতে সাক্ষী না দিলেও আইন তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না।

(দূরে রাস্তা থেকে ছেলেমেয়েদের গলা ভেসে আসছে। ক্রমেই তারা এগিয়ে আসছে।)

—ফুলবিহার আমাদের!

—নতুন পাঠশালা জিন্দাবাদ!

—নতুন পাঠশালা জিন্দাবাদ!

—ফুলবিহার আমাদের!

—আজাদ কর, আজাদ কর!

পণ্ডিত—ছেলেমেয়েরা এসে পড়েছে। তোমার হাত ধরে বলছি মহাজন, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না। ওদের ফুলবিহার দখল করতে দাও।

মহাজন—না না, ফুলবিহার আমি কাউকে দিতে পারব না!… কাউকে না!

পণ্ডিত—বেশ! তোমার যা খুসী কর। আমি চললাম।

(পণ্ডিত চলে গেল।)

কবিরাজ—কাজটা কিন্তু ভাল হল না মহাজন !

মহাজন—এঁ্যা !

কবিরাজ—না না, কিছু না। আমি···আমি তা হলে আসি। একটু কাজ আছে।

(চলে গেল। ছেলেমেয়েদের কণ্ঠ ভেসে আসছে। এতক্ষণে ওরা এসে পড়ল বলে। মহাজন গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে।)

২৯

(ফুলবিহারের দরজা। রামা যদু ও আরো দুজন লাঠিয়াল খোলা দরজা পাহারা দিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এসে পড়ল।)

বাবলু—দরজা ছেড়ে দাও—আমবা ভেতরে যাব।

যদু—বটে ? দলবল নিয়ে ফিরে যাও বাবলু! ফুলবিহার দখল করবার চেষ্টাও করো না।

গোপাল—লাঠি হাতে তোমরা কার বাড়ী পাহারা দিচ্ছ রামা ভাই !

রামা—যার টাকা তার বাড়ী। মালিকের জন্য জান দেব আমরা।

ভোলা—ফুলবিহারের মালিক আমরা।

যদু—বটে ? এই লাঠি দেখেছিস ?

গোপাল—যা অন্যায়, যা অসত্য—লাঠির জোরে তা কখনও জয়ী হতে পারে না।

বাবলু—এই আমরা বসলাম। যতক্ষণ না তোমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, এখানে বসে অপেক্ষা করব আমরা।

(ছেলেমেয়ের দল ফুলবিহারের দরজার সামনে বসে পড়ল)

রবি—গান শুনবে ?

(রবি গান ধরল। গুণ্ডারা শুনছে।)

ভজন

রবি—সৎচিৎ আনন্দ রাজারাম, পতিত পাবন গিরিপতি রাম।

কোরাস্—গিরিপতি রাম, গিরিপতি রাম।

রবি—গতি ভরতা প্রভু সাথী রাম।

সত্যিয়ম্ শিবম্ সুন্দরম্ রাম।

দুঃখ হরতা প্রভু কর্তা রাম,

পতিতপাবন প্রভু তেরে নাম।

(গুণ্ডারা আস্তে আস্তে বসে পড়ল। গানের আমেজ লেগেছে তাদের মনে। তারা আধবোজা চোখে মাথা দোলাচ্ছে। পেছন থেকে বুবু-টুবু ও অন্যান্য সব ছেলেমেয়ে বাগানের ভেতর ঢুকতে সুরু করেছে। এদিকে গান চলেছে।)

কোরাস্—প্রভু তেরে নাম, প্রভু তেরে নাম।

রবি—ও নাম জী, ও নাম জী।

শত নাম জী, শত নাম জী।

কোরাস্—ও নাম নাম নাম জী।

রবি—শত নাম নাম নাম জী।

কোরাস্—শত নাম নাম জী।

ও নাম নাম নাম জী।

নমঃ প্রভু নমঃ নমঃ।*

(গান শেষ হল। গুণ্ডারা চোখ মেলে তাকাল। এ কি! মাত্র সামনের দিকে ক'জন ছেলে বসে আছে। আর সব গেল কোথায়? বাগানের ভেতর থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই ওরা ভেতরে চলে গেছে। তড়াক করে ওঠে দাঁড়াল গুণ্ডারা।)

* তুলসীদাস

যদু—ফাঁকি দিয়ে সব ভেতরে চলে গেল!

রামা—খুব ধাপ্পা দিয়েছে বাবা!

যদু—তবে রে।

(যদু লাঠি তুলে মারতে গেল রবিকে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ছুটে এল। লাঠির ঘা পড়ল পণ্ডিতের মাথায়। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বসে পড়ল পণ্ডিত।)

বাবলু }
ভোলা } —পণ্ডিত মশাই! মামা বাবু! রক্ত!
গোপা }

বাবলু—এ কি হল!

পণ্ডিত—(কপাল চেপে ধরে) কিছু হয় নি। যদু! রামা! আমায় মেরেছিস দুঃখ নেই, কিন্তু কোন্ মুখে এদের মারপিট করতে এসেছিস তোরা? এই সব ছেলেমেয়ে তোদের জন্ম কি না করেছে? রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, এমন কি তোদের ঘরদোর নালানর্দ্দমা সাফ করে দিচ্ছে এরা! আজ কিনা টাকা খেয়ে এদের খুন করতে এসেছিস! ছিঃ···

(গুণ্ডারা লজ্জায় মাথা নীচু করল।)

ওরে যদু! ওরে রামা! এদের জয়যাত্রার পথে বাধা দিসনি। হা করে দেখছিস কি? ওরে, এরাই ফুলবিহারের মালিক, আমাদের আশা ভরসা।

(গুণ্ডারা হাত থেকে লাঠি ফেলে দিল।)

গোপা—পণ্ডিত মশাই! আমি এক্ষুনি ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি। (চলে গেল)

পণ্ডিত—বাবলু, রবি! তোরা সব অমন কাঁদো কাঁদো মুখে

দাঁড়িয়ে রইলি কেন! আয়, আমিও তোদের সঙ্গে ফুলবিহারে যাই। রামা, বদু, তোরাও আয় না।

(বাবলু ও ভোলার কাঁধে ভর দিয়ে পণ্ডিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভেতরে যেতে লাগল। গুণ্ডারা হাসি মুখে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।)

২৯

(কদিন বাদে বিকালবেলা মহাজন চাদর মুড়ি দিয়ে দাওয়ায় শুয়ে আছে। পণ্ডিত এল।)

পণ্ডিত—মহাজন বাড়ী আছ—মহাজন!...এই যে শুয়ে আছ দেখছি। শরীর ভাল নেই বুঝি? (পাশে বসল।)

মহাজন—(গা থেকে চাদর নামাল) শরীরে আর কাজ কি পণ্ডিত! মরলেই এবার সকল জ্বালা জুড়ায়।

পণ্ডিত—ছি, ওকথা বলতে নেই!

মহাজন—বলব না? আমার সারা জীবনের সঞ্চয়, গায়ের রক্ত জল করা টাকা, একটা পয়সাও কেউ ফিরিয়ে দিলে না। আমার ফুলবিহার তোমরা কেড়ে নিলে। বল পণ্ডিত, কি সুখে আর বেঁচে থাকি?

পণ্ডিত—ওসব কথা ভুলে যাও। ফুলবিহারে আজ নতুন পাঠশালার গৃহপ্রবেশ উৎসব। তোমায় ডাকতে এসেছি।

মহাজন—আমাকে যেতে বলছ? কিন্তু আমার টাকা? আমার বাগানবাড়ী?

পণ্ডিত—মহাজন! তোমার টাকায় যদি গাঁয়ের দশটা লোকের উপকার হয়ে থাকে, সে ত খুসীর কথা। কি লাভ হত তোমার গিয়ে ঐ টাকা সিন্দুকে আটকে রেখে? আর যদি ফুলবিহারের কথা বল, ফুলবিহার আজো তোমার।

মহাজন—আমার ?

পণ্ডিত—তোমার বই কি! ভেবে ছাখো তোমার ফুলবিহারে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে। তুমি আমি, যাদের নিজেদের কেউ নেই, দেশের ছেলেমেয়েরাই ত আমাদের ছেলেমেয়ে। বল সত্যি কি না ?

মহাজন—সত্যি !

পণ্ডিত—তোমার গিয়ে ঐ অতবড় বাড়ীটা পাহারা দিতে প্রাণান্ত হত তোমার। কি কাজে লাগত ঐ বাড়ী ? কোন কাজেই না। এখন বুঝলে মহাজন, ছেলেমেয়েরা শুধু ফুলবিহার নয়, বিপদে আপদে তোমাকেও দেখবে। (মহাজন সায় দেয় মাথা নেড়ে) চল তবে, আর দেরী নয়।

(দড়ি থেকে সিল্কের চাদরখানি পেড়ে, কাঁধে ফেলে দিয়ে মহাজন পণ্ডিতের হাত ধরে এগিয়ে চলল। উঠানে নামতেই কবিরাজের সঙ্গে দেখা।)

কবিরাজ—এই যে পণ্ডিত! শুনলাম আজ নাকি ফুলবিহারে উৎসব হচ্ছে ?

পণ্ডিত—শুনেছ ঠিকই। তোমাদের ডাকতে এসেছি, চল। তরুণের বিজয় নিশান আমাদের ডাকছে 'এগিয়ে চল'—'এগিয়ে চল'। তোমার গিয়ে পিছু পড়ে থাকলে চলবে কেন ? চল।

(তারা তিনজন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল।)

সমাপ্ত

বীরেন দাশের লেখা

নতুন পাঠশালা (২য় সংস্করণ)

দাম ৩৲

যুগান্তর—	···	গঠনমূলক শ্রেষ্ঠ শিশু উপন্যাস···
আনন্দবাজার—	···	মনে রেখাপাত করে···সার্থক সৃষ্টি···
প্রবাসী—	···	চিত্তাকর্ষক···অভিনব···
H. Standard—	···	Outstanding contribution···

"নতুন পাঠশালার এই শিক্ষা গ্রাম্য শিশুদিগকে আদর্শ গ্রামবাসী করার জন্য পরিকল্পিত। গ্রামের ছেলেই হোক আর সহরের ছেলে হোক, বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহা সহিত ছেলেদের যুক্ত করে। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়ের বিকাশ হয় এবং শিশুকে তার জন্মস্থানের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত করে। ইহাতে একটা ভবিষ্যতের গৌরবময় কল্পনা লক্ষ্য করিয়া পাঠশালাতেই বালক-বালিকা নিজেদের কর্তব্য পথে [illegible]।

মহাত্মা গান্ধী